অন্বেষণ

বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পুরুষ নারীকে প্রতারণা করেছে যুগে যুগে। তবু নারী বার বার সেই
পুরুষের পায়েই মাথা কুটে কেঁদে মরেছে। জীবনভোর। এ
উপন্যাসের নায়িকা হারিয়ে যাওয়া সেই অসহায়া নারী-
কুলের কেউ নয়। হেরে সে যায় নি। পরিবর্তে
নিজেকে ভালোবেসে, শেষ দিন পর্যন্ত সে
বাঁচতে চেয়েছে ভালোবাসার
মানুষের সন্ধানেই।

স্বপ্নে কাল রাতে অজিতকে দেখলাম। কদিন ধরে অজিতের কথা খুব মনে হচ্ছিল। হয়তো সে জন্যই...।

আমাদের ডিভোর্স করতে চাওয়া ব্যাপারটাতেই তীব্র আপত্তি ছিল ওর। কতবার যে আমাকে বলেছে,

— ভেঙে ফ্যালাটা খুব সহজ ব্যাপার বেণু। আর একবার ভেবে দ্যাখ তুই, দুম করে ওমন একটা ডিসিশন নিসনে।

— অনেক ভেবেছি। আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

— এখন রাগের মাথায় এসব বলছিস; রাগ পড়ে গেলে দেখবি,—

— আর হবে না রে। অনেক সহ্য করেছি আমি। আর পারছি না।

— একা একা থাকা খুব কষ্টের; তা ছাড়া—

— জানি, দ্যাখ বাংলাদেশের মেয়েরা, বিশেষ করে আমার মতো অতিসাধারণেরা সহজে ছাড়াছাড়ির পথে যেতে চায় না; এখনও নয়। অবশ্য ঠিক জানি না; শেষ পর্যন্ত আমিও হয়তো—

★ ★ ★ ★ ★

অজিত আমার খুব ভালো বন্ধু। আমাদের সম্পর্কটা বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল ও। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। আর কিছু করার ছিল না। আমাদের সম্পর্কটাতে একটু একটু করে পচন ধরছিল।

দু'জনের কেউ কথা বললেই ক্রমাগত পারস্পরিক আক্রমণ প্রতি আক্রমণে বিচ্ছিরি ঝগড়ার গন্ধ ছড়াচ্ছিল। সেই দুর্গন্ধে ঘরে টেকা যাচ্ছিল না।

কেউ কোনো কথা না বললে সম্পর্কটাকে উপর উপর কিছুক্ষণ পরিষ্কার দেখাত। কিন্তু নীচে ময়লা জমেছিল প্রচুর। এক ঘরের মধ্যে কতক্ষণ কথা না বলে চলে? আবার কথা বললেই থিতিয়ে থাকা সম্পর্কের জলটা নাড়া খেত। আর তখনই তলানির সব ময়লা উঠে আসত উপরে। ঘেটেঘুটে সবটাই ঘোলা হয়ে যেত। সম্পর্কটাকে কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আরোগ্যের আর কোনো উপায় ছিল না।

অবশ্য অনেকে নানারকম ভয় থেকে অপারেশনের পথে যেতে সাহস পায় না। বাইরে থেকেই মলম লাগিয়ে, ওষুধ খেয়ে ভেতরের ক্ষত সারানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যায় আমৃত্যু। আমিও কি সেই দলেরই একজন?

★ ★ ★ ★ ★

উত্তর চব্বিশ পরগনার এক অখ্যাত গ্রামে আমার জন্ম। পানশিউলি। কাঞ্চনপুর, বনপাহাড়ি রেখে স্থলপথের শেষপ্রান্তে পানশিউলি। লোকের মুখে মুখে এখন তা হয়ে গেছে পানসি গ্রাম। বাস, ট্রেনের অন্তিম স্টেশন এটা। সড়কপথের শেষ এখানেই। তারপর ইচ্ছেমতী নদী।

সীমান্তগঞ্জ পেরিয়ে সুন্দরীবন যেতে হলে, আমাদের পানশিউলি গ্রাম থেকে ইচ্ছেমতী পেরিয়েই যেতে হবে। সুন্দরীবন থেকে পানসির দূরত্ব অনেক।

কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি দেখেছি, শহর কলকাতার মানুষদের ধারণা, পানশিউলি মানেই সুন্দরীবন। বাঘ-ভালুকের গহন অরণ্য।

পানসি থেকে লঞ্চে সরাসরি সুন্দরীবন যাওয়া যায়। আবার ইচ্ছেমতী পেরিয়ে অটো বা ভ্যান ধরে কাটা খাল। একটা ছোট্ট নদী। এদিকে বাস চালু হয়নি। ডিঙি নৌকায় কাটা খাল পেরিয়ে আবার ভ্যান বা অটো করে সীমান্তগঞ্জ। সেখান থেকে লঞ্চে সুন্দরীবন।

পানসি রেল স্টেশনটা শেষ হয়েছে ইচ্ছেমতীকে আধামাইল সামনে রেখে। পানশিউলি রেল-লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে বনপাহাড়ি স্টেশনটা দেখা যায়। দুটো স্টেশনের দূরত্ব খুবই কম। তার উপর এখানের লাইনটাও খুব বেশি এঁকেবেঁকে যায়নি।

শেষ বিকেলে স্টেশনে এসে বনপাহাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার খুব ভালো লাগত। তবে আমাদের শিউলি স্টেশনটা বড্ড অপরিচ্ছন্ন। লাইনের দু'দিকে ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্‌বাস্তুদের বস্তি। সেই সব ঝুপড়ির এন্ডিগেন্ডিরা চারপাশটাকে বিচ্ছিরি নোংরা করে রাখে।

সে তুলনায় বনপাহাড়ি অনেক ঝকঝকে। ছোট্ট স্টেশন। দু'পাশে কোনো ঝুপড়ির ব্যাপার নেই। থাকবে কি করে? ডানদিকে জায়গার অভাব। সরু পিচ ওঠা ভাঙা রাস্তা দিয়ে সাইকেল ভ্যান রিকশা আসা যাওয়া করে কোনরকমে। বাঁদিকে দিগন্ত বিস্তৃত নিচু ধেনো জমি। সবুজের অপূর্ব ঢেউ।

সেই ধেনো জমির শেষ মাথার দিকে সারে সারে লম্বা লম্বা নারকোল গাছ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য ওঠা! সে এক দেখার জিনিস! রঙের যে কত বিচিত্র খেলা! প্রতিদিন! এ-বেলা ও-বেলা। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তে। মানুষের জীবন কেন এমন রঙিন, বৈচিত্রময় হয় না?

বনপাহাড়ি স্টেশনের সামনে ছিল মস্ত বড়ো দুটো গাছ। পাশাপাশি। লোকে বলত, রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন।

গ্রীষ্মকালে লাল টকটকে কৃষ্ণচূড়া আর হালকা মিষ্টি বাসন্তী রঙের রাধাচূড়া ফুলে গাছ দুটো ভরে থাকত। স্টেশনের চারপাশের মাটিতে সেই লাল হলুদের ফুলশয্যার নরম বিছানা ছিল দেখার মতো। বনপাহাড়ি স্টেশনে তখনও উঁচু পাকা শান দেওয়া প্ল্যাটফর্ম হয়নি।

পানশিউলি স্টেশনের বাঁদিকে একটা ছোটো খেলার মাঠ। মাঠটাকে ডাইনে ফেলে লম্বা বড়ো খালটার উপরের সাঁকো পেরোলেই রতনদের বাড়ি। কঞ্চি দিয়ে ঘেরা ঘন রাংচিতার বেড়াটা তাদের বাড়ির চৌহদ্দি। সেটা শেষ হলে তালপুকুর। পুকুরের ও পারেই মানুদের বাড়ি। তারপর পুলিন জেঠুদের উঠোন পেরোলেই মাদার গাছের খুঁটি দেওয়া আমাদের বনতুলসী আর রাংচিতার লম্বা বেড়াটা দেখা যেত।

বেড়ার মাঝখানের টাটি ঠেলে সোজা ঢুকে গেলেই উঠোনের ডানদিকে গোলা। বাঁদিকে আমাদের বিচুলি-চালের মাটির দাওয়া। মা সর্বক্ষণ ঝকঝকে করে রাখত। সেই উঠোন। গোলা। হাতনে। ঘরদোর সব।

আমাদের মা-বাবা দু'জনেই ছিলেন বেশ বেঁটে। তাঁদের গায়ের রংও বেজায় কালো। আমরা তিন ভাই বোনই সেই সাইজ ও কালার পেয়েছিলাম। তবে নদীর ধারের নোনা হাওয়াতে আমি একটু বেশি ঘুরতাম বলেই হয়তো, রংয়ের ব্যাপারে বাড়ির সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। যাকে বলে একেবারে মিশকালো। মহিষের মতো। কী খসখসে চামড়া!

মুখশ্রী সুন্দর হলেও আমার চেহারাটা নাকি থলথলে মোটা জলহস্তীর মতো ছিল; কতবার যে পাবলিকের এই কথাটা কানে এসেছে আমার। কেউ কেউ আবার আমাকে জলহস্তী না বলে মোষ বলতেই ভালোবাসত। এ সব শুনে শুনে

এখন আর আগের মতো আলাদা করে খারাপ লাগে না। অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন তো বেশ নির্লিপ্ত হয়েই ভাবতে পারি; চকচকে তৈলাক্ত জলহস্তীর রং, মহিষের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল। যথেষ্টই গ্লামারিয়াস।

আসলে আমার রং ও ত্বক নিয়ে চারপাশের শিক্ষিত ভদ্রজনেরা আমার মধ্যে অসম্ভব হীনম্মন্যতা তৈরি করে দিয়েছিল। বিশেষ করে রতন। আর ওদের গোটা ফ্যামিলি।

একে অমাবস্যার মতো কালো রং আমার; তাতে ত্বকটাও যদি পালংশাকের মতো একটু নরম, পেলব, লাবণ্যময় হত! বিধাতা সেদিকেও মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন। আমার ত্বক ছিল খসখসে ডুমুর পাতার মতো।

একবার আমি মুনমুন সেনকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। কী সব মেখেটেখে আমার ত্বক একেবারে মুনমুনের মতো হয়ে গেছে। সেই একই স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল রিয়াও। অবিকল তার কণ্ঠস্বর সমেত 'আমার মা সব সময় বলতেন, তেল মাখো রিয়া, তেল মাখো'। তারপর পর্দা জুড়ে নাভি-টাভিতে ম্যাসাজ—। 'আমাকে মুনমুন সেনের মতো দেখতে? আমার মা আফটার অল।'

এ স্বপ্ন আমি দেখেছি এই তো সেদিন। অনেক বেশি বয়সে। রু তখন বেশ বড়ো হয়ে গেছে। আমি তো প্রায় বুড়ি। এখনও আমার অবচেতনে রং ত্বক নিয়ে কী হীনম্মন্যতা রয়ে গেছে? না কি এমনি এমনি স্বপ্ন; কে জানে?

ইদানীং মনে হয়, কত বয়স হয়ে গেল? আমাদের সময়ের সেই মুনমুন সেনের মাখন শরীর থেকে, এখন রু-য়ের মুখে শুনি ব্যান্ডের গান, ত্বকের যত্ন নিন।

* * * * *

ভাইবোনদের মধ্যে লেখাপড়ায় আমি সব থেকে ভালো ছিলাম। স্কুলে প্রতিবছর স্ট্যান্ড করতাম। তারপর বনপাহাড়ি গভর্নমেন্ট কলেজে ভরতি হই পাস-এ।

সংস্কৃত আমার বেশ ভালো লাগত। এইচ.এস.-এ লেটারও পেয়েছিলাম। সংস্কৃতে অনার্স নেওয়ার আমার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাড়ির লোকের ইচ্ছেতে অনার্সের পরিবর্তে পাশেই ভরতি হতে হয় আমাকে।

অনার্স মানে বাড়তি আরও এক বছর পড়া। অভাবের সংসারে মা সেটা চাননি। চাননি রতনও। যিনি আমার দীর্ঘদিনের প্রেমিক ছিলেন। পরবর্তীকালে আমার স্বামী ও একমাত্র পুত্রের জনক।

অনেক ছোটোবেলা থেকে আমি টিউশন করে নিজের প্রায় সব খরচ চালাতাম। টিউশন আরও কয়েকটা বাড়িয়ে কষ্ট করে আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু রতন আর ওদের বাড়ির কেউই না চাওয়ায়...।

নারীর বিদ্যে বেশি হয়ে যাক, এ বোধহয় মনে প্রাণে কোনো পুরুষই চায় না। বিশেষ করে স্বামী পুরুষ প্রজাতি তো নয়ই।

* * * * *

পাঁচটা মানুষের পেট। তার মধ্যে আবার তিন জনের স্কুল কলেজের পড়াশোনা। এস.সি. কোটার জন্য বছরে কিছু স্টাইপেন্ডও পেতাম আমি।

তবু সামান্য চাকুরে বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। বিভূতিভূষণ মার্কা নিপাট ভালোমানুষ ছিলেন আমার বাবা। কোনো ব্যাপারেই মুখে রা কাটতেন না।

নিতান্ত সাদাসিধে সাতে-পাঁচে না থাকা শান্তশিষ্ট কম কথার মানুষ তিনি। বারাসত কোর্টের মুহুরি ছিলেন আমার বাবা। সুযোগ পেয়েও কখনো এক পয়সাও অসৎ উপায়ে আয় করেননি তিনি।

অভাবের সংসার। কালো দিদিকে বিয়ে দিতে বাবাকে ধারকর্জ করতে হয়েছিল ঢের। সে দেনা আমৃত্যু শুধতে হয়েছিল তাঁকে।

বাংলাদেশের অতিসাধারণ একটা কালো মেয়েকে পার করার একমাত্র উপায় যে মোটা পণ, তা দিদির বিয়ে দিতে গিয়েই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন বাবা। শুধু মোটা টাকাই নয়। তাদের চাহিদা মতো সোনাদানাও স্যাকরা সঙ্গে এনে মেপে নিয়েছিল তারা। মা প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন,— বেণুকে দেওয়ার মতো একগাছা চুড়িও আমার আর সম্বল নেই।

আমিই তখন বাড়ির বড়ো মেয়ে। ভাই ছোটো। মায়ের হাতে হাতে সংসারের অনেক কাজকর্ম করতে হত আমাকে। এখনকার মতো পড়াশোনা করছে বলে মেয়েরা যেমন সংসারের কুটোটি নেড়ে খায় না, আমাদের সময়ে তেমন সৌভাগ্য প্রায় কারোর ছিল না।

অতিরিক্ত পরিচ্ছন্ন স্বভাবের পিটপিটানির জন্য মাও দিনরাত কম পরিশ্রম করতেন না। সে তুলনায় খাওয়াদাওয়া তো তেমন জুটত না। অপুষ্টির দুর্বলতায় দিবারাত্র পরিশ্রম করে আর পেরে উঠত না মানুষটা।

এমনিতে সংসারের কাজ করতে আমার ভালোই লাগত। স্কুল-কলেজ করে,